

তৃতীয় অধ্যায়

নারীবাদ

(Feminism)

দৈহিক বা জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষকে 'নারী' ও 'পুরুষ' এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একে sex-difference বা যৌন পার্থক্য বলা হয়। নারী-পুরুষের এই যৌনভেদ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ যৌনভেদের সঙ্গে আর এক প্রকার ভেদকে যুক্ত করে যাকে বৈষম্য বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। সমাজ নারীকে মানুষ বলে মনে করার পরিবর্তে পুরুষ জাতি থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে দেখেছে। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি যে সমাজ নারীত্বের সঙ্গে এমন কিছু কিছু ধর্ম যুক্ত করেছে যা শুধুই নারীর ধর্ম, পুরুষের ধর্ম বা সামগ্রিকভাবে মানুষের ধর্ম নয়। আবার পুরুষত্বের সঙ্গে এমন কিছু কিছু ধর্ম যুক্ত করা হয়েছে যা নারীর ধর্ম নয়, একান্তভাবে পুরুষেরই ধর্ম। এই ধর্মগুলি কোন মানুষেরই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ধর্ম নয়। আমাদের সমাজ এই ধর্মগুলিকে নারী ও পুরুষের উপর আরোপ করে। আসলে সমাজ নারী ও পুরুষের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশাই তাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ-ধর্ম আরোপের জন্য দায়ী। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রভেদ শুধুই জৈবিক তার নাম যৌন প্রভেদ বা sex difference। এই প্রভেদ মানুষ বা সমাজের দ্বারা সৃষ্ট নয়। অপরপক্ষে সমাজ তার চাহিদা বা প্রত্যাশার দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করে তার নাম লিঙ্গ-ভেদ বা gender-difference।

সমাজের দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গ ভেদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। নারীর সম্ভাবন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমাজ নারীর উপর প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সম্ভাবন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারী ছাড়া আর কারও ভূমিকা স্বীকার করা হয়নি। কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে

নারীদের কর্মজীবন পরিবারের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এইভাবে সমাজ নারীর অবস্থানকে গৃহকর্মের সঙ্গীর্ণতার মধ্যে ক্রমশ সঙ্কুচিত করেছে। বৃহত্তর সমাজের নানা বৃত্তিতে তার প্রবেশের অধিকারকে অস্বীকার করেছে। এইভাবে নারীর জন্য বেখে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু কাজ সমাজের দৃষ্টিতে যা তার লিঙ্গের পক্ষে উপযোগী (gender-specific)।

নারীবাদীরা এই লিঙ্গ বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন যে নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক গঠনের ভেদ থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গগত ভেদ নেই। 'sex' ও 'gender' এই দুটি ইংরাজী শব্দের পার্থক্যের প্রতি নারীবাদীরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'sex' শব্দটি নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে বোঝায়। কিন্তু আমাদের সমাজ এই পার্থক্যের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে। এই সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ প্রত্যাশা করে। মনে রাখতে হবে যে এই আদর্শ সমাজের দ্বারা কল্পিত বা উদ্ভাবিত। সমাজ পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করে সাহস, দৃঢ়তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং নারীর মধ্যে দেখতে চায় কোমলতা ও নমনীয়তা। সমাজ এইভাবে লিঙ্গভেদ সৃষ্টি করে। Gender কোন মানুষের স্বরূপগত ধর্ম নয়। সমাজ gender সৃষ্টি করে। আসলে মানুষের কোন gender বা লিঙ্গ নেই— 'individuals do not have gender'। কোন মানুষ নারী হয়ে জন্মায় না; সমাজ তাকে নারীতে পরিণত করে— 'one is not born, but rather becomes, a woman'.

সমাজের আদি লগ্ন থেকেই যৌনভেদের সঙ্গে লিঙ্গভেদ যুক্ত হয়েছে। এর ফলে যে বিভেদ বা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিণাম পুরুষের পক্ষে অবমানকর না হলেও নারীদের পক্ষে তা অবদমনের সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই বৈষম্য নারী ও পুরুষকে বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছে। নারী দুর্বল, পরনির্ভর, অনাগ্রাসী, উচ্চাভিলাষ বর্জিত। অপরপক্ষে পুরুষ আগ্রাসী, আত্মনির্ভর স্বশাসিত, সক্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মপ্রত্যাঘী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নারী ও পুরুষের অধিকাংশ ধর্মই পরস্পরবিরোধী। এই জাতীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ তাদের বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছে। নারী ও পুরুষ শুধু যে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে তাই নয়, তাদের পারস্পরিক মূল্যও ভিন্ন। পুরুষের সামাজিক অবস্থান যদি কেন্দ্রে হয় তা হলে নারীর অবস্থান প্রান্তসীমায়। কেন্দ্রে যার অবস্থান সেই সমাজে মহান। সমাজে তারই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই। প্রান্তিক অবস্থান থেকে নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না।

শুধু তাই নয়— পুরুষ নারীকে অবদমন করেছে এবং সমাজে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পুরুষতন্ত্র শুধু নারীদের অবদমনের হাতিয়ার নয়, এর মধ্য দিয়ে নারীর

শ্রোনীতে
পুরুষের
ভেদের
ভাবিক
একটি
নারীদের
ধর্ম বা
ধর্ম যুক্ত
কোন
গারী ও
ম ভিন্ন
রাপের
প্রভেদ
রপক্ষে
সৃষ্টি
সম্পন্ন
উপর
আর
সঙ্গে

অবমূল্যায়ন হয়েছে। কতকগুলি ধর্মকে নারীসুলভ বলে নির্দিষ্ট করার বাস্তবিক কোন হেতু নেই। নারীত্বের সঙ্গে যে ধর্মগুলি যুক্ত হয়েছে সেগুলি প্রশংসনীয় বা শাস্ত্রীয় হতে পারে। কিন্তু প্রশংসা সেখানে নয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর এই লৈঙ্গিক ধর্মভেদ ভিত্তিহীন। একথা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে জন্মলগ্ন থেকেই একজন নারী বা পুরুষের কর্তব্য বা আদর্শ স্থির হয়ে যায়। বরং একথাই কি সত্য নয় যে পুরুষ ও নারী উভয়ই মানুষ? সমাজ মানুষের কর্তব্য বা আদর্শ নির্দিষ্ট করতে পারে। সেই কর্তব্যের সঙ্গে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই।

লিঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনার ইতিহাস দীর্ঘ ও বহুবিচিত্র। প্রথম যুগের আলোচনায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে দরিদ্র ও কৃষাঙ্গ মানুষের মতো নারীরাও প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী লিঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হয়ে রয়েছে। প্রকৃতিগত কারণেই নারী পুরুষের তুলনায় শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দুর্বল। যেমন ১৮৪৭ সালে ডঃ চার্লস মার্গিস লিখেছিলেন যে নারীদের মস্তিষ্ক পুরুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ক্ষুদ্র। তাই নারীরা বৌদ্ধিক বা মননশীল ক্রিয়ায় দক্ষ নয়। নারীদের শারীরিক দুর্বলতার কথা আরও একজন বলেছিলেন যার নাম ডঃ এডওয়ার্ড ক্লার্ক। তিনি 'Sex and Education' নামক গ্রন্থে বলেছিলেন যে পুরুষদের মতো নারীদেরও শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ফলে নানা বিপর্যয় ঘট। তাদের দুর্বল শরীর শিক্ষা গ্রহণের চাপের ফলে দুর্বলতর হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপর এই দুর্বলতার প্রভাব পড়ে।

১৮৭৭ সালে ডঃ মেরী জ্যাকবি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে উপরোক্ত মতবাদকে খণ্ডন করেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করেন যে নারীরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল নয়। শরীর এবং বুদ্ধি কোন দিক থেকেই নারীকে পুরুষের নীচে স্থান দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করলে নারীর শরীর আরও সবল হয়। তাদের নারীত্ব আরও পূর্ণ হয়। ১৯০৩ সালে হেলেন উলি প্রমাণ করেন যে মানসিক সামর্থ্যের দিক থেকে তিন্দভেদ অপ্রাসঙ্গিক। মননশীলতায় নারী ও পুরুষ সমান। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে এই বিষয়ে কোন গবেষণাই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠেনি। এই সমস্ত গবেষণায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। নারীদের মনোজ্ঞপৎ সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্যকেও কুসংস্কারগ্রস্ত বলা হয়, কারণ ফ্রয়েডও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

আধুনিক যুগে নারীবাদী আন্দোলন আরও গতিলাভ করেছে। মহিলা মনোবিজ্ঞানীরা নারী মনস্তত্ত্ব আলোচনার জন্য নানা সজ্জা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নারীবাদ নারীদের এই অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করার একটি প্রয়াস। পুরুষতন্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নারীবাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ তার ফলে পুরুষতন্ত্র আঁজ যে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে আগামীকাল

তাদের ক্ষমতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নীতিবোধ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। পুরুষকে যদি সংসারের সীমিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হত তাহলে পুরুষের মধ্যেও সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হত যা নারীসুলভ বলে পরিচিত। সমাজ মানুষকে বিভিন্নভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে।

সমাজ শুধু পুরুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে। নারীকে শিখিয়েছে ভদ্রতা ও নৈীজ্ঞান। ওলট্টোনক্রাফট মনে করেছেন যে নারীর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য তাদের পুরুষের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। নারীরা যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবদানিত হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি পেলেই তাদের মধ্যে সৃষ্ট নীতিবোধ জাগ্রত হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মিল বলেছিলেন যে নৈতিকতা বা অন্যান্য মূল্যবোধের সঙ্গে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজ নারী ও পুরুষের নৈতিকতাকে একই মানদণ্ডে বিচার করেনি। মিল সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। 'The Subjection of Women' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজই নারীর মধ্যে নানা মহৎগুণ সৃষ্টি করেছে। এই সমাজই নারীকে শিখিয়েছে অপরের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে। নারী শুধু পেওয়ার জন্য জন্ম নিয়েছে, গ্রহণ করার জন্য নয়। সে হবে সম্মর্পিত, কষ্টসহিষ্ণু। এই সমস্ত গুণকে সমাজ তার উপর আরোপ করে তাকে মহৎ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

নারীর ধর্ম বা নৈতিক আদর্শ সমাজের দ্বারাই আরোপিত— এই ধারণার প্রতিনন্দ সম্প্রদে কোন প্রশ্নই করা যায় না। তবে বিগত শতাব্দীতে আমরা আর একটি ধারণার সাক্ষাৎ পাই। অনেকে মনে করেন যে নারীর নৈতিক মূল্যবোধ পুরুষের মূল্যবোধের তুলনায় উন্নত। তবে সেই ধর্ম বা মূল্যবোধ পুরুষেরও অনুকরণীয় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

Catherine Beecher এর মতে গৃহই নারীর স্থান। তবে নারীর ক্রিয়াকর্ম আদৌ মূল্যহীন নয়। নারী সংসার গড়ে তোলে, পরিবারকে লালন করে যার মধ্যে মানুষের নৈতিক ধর্মের স্ফূরণ হয়। সংসারের বন্ধন আছে বলেই পুরুষ জাতি কাজ করতে পারে। এই চিন্তাবিদদের মতে নারীর গৃহকর্মের জন্যও বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই দক্ষতা আছে বলেই সমাজে শুচিতা থাকে, সমাজের মানুষ নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ ব্রতী হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে Elizabeth Stanton পুরুষ ও নারীর নীতিবোধের পার্থক্যের কথা বলেছিলেন। তথ্যভা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে নারীর নৈতিক মূল্যবোধ পুরুষের নীতিবোধ অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু সমাজ পুরুষের নৈতিকতাকেই সমাজের

নৈতিক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। নারীর নীতিদোষকে হয় দমন করা হয়েছে অথবা উপেক্ষা করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নারীকে বাহিরের জগতে প্রবেশ করতে দিতে হবে। নারী শুধুই তার গৃহকোণের ব্যক্তিগত জগতে আবদ্ধ থাকবে এবং তার নৈতিক আদর্শ শুধুই এই সীমিত জগৎকে প্রভাবিত করবে— এইরকম পরিস্থিতি কাল্পনিক নয়।

আধুনিক নারীবাদীদের মধ্যে Carol Gilligan এবং Nel Noddings মনে করেন যে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নারীত্বের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধর্মকে তুচ্ছ করা হয়েছে। এর জন্য ফ্রয়েডকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। ফ্রয়েডই বলেছিলেন যে একমাত্র পুরুষেরই নৈতিক মূল্যবোধ আছে, নারীদের তা নেই। ফ্রয়েড নারীদের নৈতিক দিক থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেছিলেন। Gilligan-এর মতে নারী ও পুরুষের নৈতিকতার তুলনা করা অযৌক্তিক। যা সত্য তা এই যে নারীর নৈতিকতা বেশ পুরুষের নৈতিকতাবোধ থেকে ভিন্ন। দীর্ঘ সমীক্ষার শেষে তিনি দেখেছেন যে নারীর নীতিবোধের মধ্যে আছে মমতা, যত্ন ও দায়িত্ববোধ যা পুরুষের নীতিবোধের মধ্যে অপ্রাপ্য। নারীর নীতিদর্শন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে না। নারীর নীতিবোধ তিনটি পর্যায়ে ক্রমবিকশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে নারী নিজের স্বার্থকে দেখে; দ্বিতীয় পর্যায়ে সে অপরের স্বার্থচিন্তা করে; তৃতীয় পর্যায়ে সে নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে। নারী মনে করে যে অন্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে সে এমন একটি সত্যায় পরিণত হয় যে সম্ভার কাছে তাই নীতিগতভাবে ভালো বলে মনে হয় যা নিজের ও অন্যান্য সমষ্টিবদ্ধ সম্ভার পক্ষে ভালো।

আধুনিক যুগে নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তার নাম সিমোঁ দ্য বুভোয়া (Simone de Bouvoir)। তিনি তাঁর 'The Second Sex' নামক গ্রন্থে নারীবাদকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন। সমাজে নারীর পরিচয় এই যে সে পুরুষ নয়। একমাত্র পুরুষই স্বসত্তা বা self, কারণ পুরুষ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী; সে স্বতন্ত্র পরসত্তার ধর্ম পরাধীনতা। পুরুষের কাছে নারী যেন একটি বস্তু যাকে সে অবদমন করতে পারে। পুঞ্জিপতিরা সর্বহারাদের, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের এইভাবে পরসত্তা হিসাবে দেখেছে এবং তাদের নির্যাতন করেছে। পরসত্তা রূপে নারীও পুরুষদের হাতে একইভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

কিন্তু নারী কেন পরসত্তা থেকে স্বসত্তায় উন্নীত হতে পারছে না? বুভোয়া স্বীকার করেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈবিক পার্থক্য আছে। নারীর মাতৃত্ব, তার সম্ভ্রান প্রতিপালনের দায়িত্ব তাকে স্বসত্তা হয়ে উঠতে দেয়নি। শারীরিক দুর্বলতাও তার স্বসত্তা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নারীর এই

সমস্ত ধর্মের উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অত্যাদিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু নারীকেই স্থির করতে হবে তার এই সমস্ত ধর্মের মূল্য কতখানি। তবেই সে নিজেকে স্বসত্তায় পরিণত করতে পারবে।

যুতোয়া তাঁর গ্রন্থে শুধু জীববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি মানোবিশ্লেষক ফ্রয়েডের মধ্যেও দেখেছেন নারীকে পরসত্তায় পরিণত করার প্রকৃতি। ফ্রয়েডও নারীকে পুরুষের তুলনায় নিম্ন মর্যাদা দিয়েছেন।

যে সমস্ত চিন্তাবিদদের আমরা যুগান্তকারী মতবাদের ব্রষ্টা বলে মনে করি তার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তা মার্কস অন্যতম। নারীরা নির্যাতিত—তার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তা মার্কস অন্যতম। নারীরা নির্যাতিত—একথা মার্কসও স্বীকার করেন। তবে তিনি এই নির্যাতন ও নারীত্বের অবমূল্যায়নের কারণকে খুঁজেছেন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। তাঁর মতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ বা অবসান না হলে কোনরকম নির্যাতনেরই শেষ হবে না।

যুতোয়া মনে করেন যে ফ্রয়েডের মতবাদে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। জৈবিক কারণে নারীকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করার পিছনে তিনি পুরুষতান্ত্রিকতার ভূমিকাকে লক্ষ্য করেছেন। মার্কসের ব্যাখ্যাও গ্রাস্ত্র নয় কারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নারীর অবদমনের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু নারী নির্যাতনের অবসান হবে এমন কথা বলার কোন হেতু নেই।

যুতোয়া মনে করেন যে নারীকে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে সে পরসত্তা বা বস্তুসত্তা থেকে যথার্থ স্বসত্তা বা ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হতে পারে। এর জন্য চাই নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পরিবারের সক্ষমতার বাইরে গিয়ে তাকে আরও বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। নারীকে আরও সমাজসচেতন হতে হবে যাতে সে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এর জন্য নারীকে সংগ্রাম করতে হবে কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে সহজে এই অধিকার দেবে না। তবু যুতোয়া আশাবাদী। নারী একদিন ‘মানুষ’ হিসাবে পরিচিত হয়ে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে।

নারীবাদী নীতিদর্শন—

নীতিদর্শনকে সাধারণত পক্ষপাতশূন্য বলে মনে করা হয়। পক্ষপাতশূন্য এই অর্থে যে এই নীতিদর্শন ত্রিশদ্বিরূপেক্ষ। নৈতিক মূল্য পুরুষসাপেক্ষ বা নারীসাপেক্ষ নয়।